Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 129 – 135
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তাঁর অর্থনৈতিক দারিদ্র চিন্তার একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

বিমলেশ মান্না
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : bimalesmanna2016@gmail.com

Keyword
সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ, অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনা, ঔপনিবেশিক বাংলা, ভারত ও বর্হিভারত, নিম্নবর্ণীয় সমাজ, নিম্নবর্গীয় সমাজ, মালো সম্প্রদায়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।

Abstract
বিংশ শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাস এবং আর্ন্তজাতিক ইতিহাস বহুল ঘটনাপূর্ণ। এই শতকেই দুই বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮ ও ১৯৩৯-১৯৪৫) ও অর্থনৈতিক মহামন্দা (১৯২৯) দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বর্ষেই সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) আর্বিভাব নিম্নবর্ণীয় নিম্নবৃত্ত মালো পরিবারে। তাঁর জীবদশায় বহু প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতা রচনা করেছেন। যদিও অদ্বৈতের রচনা সম্ভার প্রাথমিক পর্বে বেশি আলোচিত হয়নি। মূলত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অদ্বৈতকে অমরত্ব দান করেছে আলোচ্য প্রবন্ধে উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম', ছোটগল্প 'স্পর্শদোষ', কবিতা 'ত্রিপুরা লক্ষী', প্রবন্ধ 'ভাইফৌটার গান' এবং 'রুগ্ন অবস্থায় লেখা চিঠি' প্রভৃতি অদ্বৈতের সাহিত্যিক সৃষ্টি গুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁর রচিত রচনা গুলির অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনাকে সূক্ষাতি সূক্ষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে প্রধানত মালো সম্প্রদায়ের নদী ভিত্তিক স্বল্প উপর্জনের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'স্পর্শদোষ' নামক গল্পে বাংলার পল্লীর গৃহবধূর অভাব অনটনের কথা আলোচনা করেছেন। 'ত্রিপুরা লক্ষী' কবিতাতে ঔপনিবেশিক বাংলার মন্বন্তরের ইতিহাসের কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। 'ভাই ফোঁটার গান' প্রবন্ধে বাংলা তথা ভারতের পৌরানিক কাহিনির আর্থিক অভাবের ভাবনাকে সামাজিক আর্থিক অভাবের প্রতিচ্ছবি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর রচিত অপ্রকাশিত 'আশালতার মৃত্যু' গল্পটিও খুবই মর্মস্পর্শী। সেখানে আর্থিক অভাব সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকারের উদাসিনতাকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর রচনা সমুহে ঔপনিবেশিক বাংলা, ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরের আর্থিক সংকটের ইতিহাসকে সাহিত্যে বর্ণনা করেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) ফলে অর্থনৈতিক সংকটকেও তুলে ধরেছেন। এছাড়া কুমিল্লার মালো সমাজের আর্থিক অনগ্রসরতার ইতিহাসকে তিনি বর্ণনা করেছেন। অদ্বৈতের লেখনী প্রধানত নিম্নবর্নীয় তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রান্তিক আর্থিক দিক থেকে অসহায় মানুষের কথা ব্যক্ত করেছেন।

Discussion

ভূমিকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই নদী সমূহকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন মানব সভ্যতার (যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ৮০০০-২০০০ খ্রীষ্ট পূর্ব, সুমেরীয় সভ্যতা ৪৫০০-১৯০০ খ্রীষ্ট পূর্ব, হরপ্পা সভ্যতা ৩২৫০-১৭৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব, মিশরীর সভ্যতা ৩১৫০-৩১ খ্রীষ্ট পূর্ব, ইত্যাদির) সূচনা হয়েছিল। যা আমরা ইতিহাসের পাতায় প্রত্যক্ষ করে থাকি। ঠিক তেমনি ভাবেই তিতাস নদী কেন্দ্র করেই কুমিল্লার মালোসমাজ তথা লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) আর্বিভাব হয়েছিল। ব্যক্তি অদ্বৈতকে আশ্রয় করেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন স্থায়িত্ব লাভ করেছে বলেই পাঠকবর্গের ধারনা। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একে অপরের পরিপূরক। অদ্বৈত মল্লবর্মন কুমিল্লার মালোপাড়া থেকে রাজধানী কলকাতায় যেমন বিচরণ করেছিলেন, তেমনি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও অবাধে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে চারটি ছোট গল্প, ছয়টি কবিতা, চব্বিশটি প্রবন্ধ বা নিবন্ধ এবং উপন্যাস লিখেছেন তিনটি। অদ্বৈতের অপ্রকাশিত গল্পও রয়েছে একটি সেটি হল আশালতার মৃত্যু। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতে ধরা পড়েছে ঔপনিবেশিক বাংলা, ভারতবর্ষ এবং এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ব্যথিত, ক্ষুধিত ও অর্থনৈতিক ভাবে দারিদ্র মানুষের চালচিত্র। যদিও তাঁর লেখাপত্র বহু কাল নির্জন নিভৃতে ছিল কিন্তু বর্তমানে লেখক ও গবেষকদের নিরলস প্রয়াসের দ্বারা আবিস্কারের ফলে ভারত তথা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারেও বিপুল সমাদর লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। মানব সভ্যতার সূচনা কাল থেকেই আমরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি বৈপরীত্য স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ করে থাকি। যদিও মার্কসের ধারনা অনুযায়ী আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী কালে শ্রেণী সংগ্রাম বা বৈপরীত্যের সূত্রপাত ঘটেছিল। তাঁর মতে বস্তুজগতের মধ্যে বিপরীত মুখী শক্তির দ্বন্দ্বের ফলে যেমন বস্তুজগতের আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনি মানব সমাজেরও বিকাশ ঘটেছে তার আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ফলে।[১] আর এই বৈপরীত্যের পরিধিও ব্যপক যেমন আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল, জন্ম-মৃত্যু, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি।

অদ্বৈত তাঁর স্বল্পময় জীবত কালে যে সমস্ত সাহিত্যিক ফসলগুলি সৃষ্টি করেছিল তাতে এক হৃদয়বান মরমীদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যা। এবং তিনি এক ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর লেখা সমুহে সমাজের প্রায় সবধরনের ব্যথাতুর চিত্রগুলি ধরা পড়েছে। যেমন প্রাচীন ভারতীয় জাত ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের প্রভেদ, ধনীর প্রাচুর্য্যতা, দারিদ্রের ব্যকুলতা, মুক্তিকামী মানুষের আকুতি, হিন্দু মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সমকালীন সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাঁর সুনিপুন লেখনিতে ধরাপড়েছিল। যদিও আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু হল লেখক অদ্বৈতের লেখা সমুহে সমকালীন অর্থনৈতিক দারিদ্র ভাবনা কিভাবে ফুটে উঠেছিল তারই একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

কুমিল্লার মালো সম্প্রদায়ের স্বল্পজীবি লেখক, কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রী অদ্বৈত ছিলেন বাংলা ভাষার এক উল্লেখ যোগ্য কথা সাহিত্যিক। অদ্বৈত তাঁর কলমের মাধ্যমে কেবল মালো সমাজের কথাই তুলে ধরেনি সেখানে তিনি জরাজীর্ন, চাল চুলোহীন এবং সমাজের দারিদ্র পীড়িত মানুষদের কথাকেই বেশী মাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছেন।[২] অদ্বৈত নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তাঁর অমর সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম' কে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী কালে তাঁর ঐ উপন্যাসটি অবলম্বনে দুই ভারত বিখ্যাত শিল্পী উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) ও ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) নাটক (১৯৬৩) এবং চলচ্চিত্রে (১৯৭৩) পরিবেশন করে অদ্বৈতকে চিরকালীন স্থায়িত্বের আসনটি প্রদান করেছেন।[৩] ঐ উপন্যাসেই তিনি অস্পৃশ্য নিম্নবর্নের মালোদের দারিদ্র পীড়িত করুন ইতিহাস তথা ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের দারিদ্রিক অবস্থাকে সুনিপুন ভাবে সাহিত্যের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন।

তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য মানুষদের আনন্দ, বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং তাদের সমগ্র জীবন যুদ্ধের একজন অংশিদার হিসাবে নিম্নবর্নীয় সাহিত্যিক রূপে আর্বিভুত হয়ে অদ্বৈত তৎকালীন সমাজ

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-II, April 2023, tirj/April23/article -18
Website: www.tirj.org.in, Page No. 129-135

রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে আমরা দেখতে পায় মালোরা সামাজিক ভাবে যেমন পিছিয়ে ছিল তেমনি আর্থিক দিক থেকেও তারা পিছিয়ে ছিল। কারন কেবল মাত্র তিতাসকে কেন্দ্র করেই তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি। তিতাস থেকে যেটুকু রোজগার হয় তাদিয়ে তারা সারাবছরের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকে কোনক্রমে। তাই অদ্বৈত লিখেছেন –

> "নিত্যানন্দ পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনা নাই।"[৪]

এই মন্তব্যের দ্বারা লেখক বলতে চেয়েছেন যে যৎসামান্য রোজগারে যেখানে সংসার অচল সেখানে ঐ দরিদ্র মানুষজনের কাছে তামাকের নেশা বিলাসিতাসম।

নদী কেন্দ্রীক উপন্যাসে মরশুম ভিত্তিক উপার্জন প্রত্যক্ষ করে থাকি। যা দিয়ে তাদের সারাবছর ব্যয়ভার বহন করতে হয়। ফলে সেখানে সাংসারিক অর্থনৈতিক দারিদ্র নিত্য সঙ্গী, যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে আমরা আরো প্রত্যক্ষ করতে পারি–

> "বর্ষায় খুব কষ্টে পড়িল। অনন্তর মা খায় কি। এই সময়ে মাছ খুব পড়ে। কিন্তু তার আগেই সকলের জাল বোনা শেষ হইয়া যায়। তারপর আর কেউ সুতা কিনিতে আসে না। সুতা কাটাতে আর হাত চলে না। বিক্রি হয় না, কাটিয়া কি লাভ। তার সংসার অচল হইয়া পড়িতেছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পারিয়া অনন্ত দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছে।"[৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং ইংরেজদের শাসনে ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থিক অনটন কোন মাত্রাই পৌছেছিল তা আমরা অদ্বৈতের এই উপন্যসের মাধ্যমে খুব ভালো ভাবে উপলবদ্ধী করতে পারি – 'কাদিরের হাটে আলু বিক্রি করতে গিয়েছিল, দুই-চারিটা ছোট ছোট আলু এপাশ ওপাশে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। আর সেগুলি মালিকের অধিকারের বাইরে মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিতেছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভিখারির ছেলে নয় কিন্তু, ইহারা সবখানেই আছে, সব দেশে সব গাঁয়ে আর সব গাঁয়ের বাজারে। কাদিরের ঐ দুঃখী ছেলেদের কিছু না বললেও বেপারীরা তাদের ধমক দিত। আলুতে হাত দিলে চড়চাপড় মারে'।[৬] এই সব ঘটনাকে লেখক আর্থিক দারিদ্রের ফল হিসাবেই বর্ননা করেছেন। কারন তখন বৃটিশ শাসন ও শোষণ চরম পর্য্যায়ে গিয়েছিল। এছাড়া অদ্বৈত আরো লিখেছেন এবং অনন্ত নিজে মন্তব্য করেছেন–

> "মা কোনদিন পয়সা দিয়া পান কিনিয়া খাইতে পারে নাই। তার হাতের কুড়ানো পচা পান পাইয়া মা কত খুশি হইয়াছে।"[৭]

প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি যে খাদ্যাভাব। এবং আমরা জানি আর্থিক সংকটের কারনেই খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়।

এই ভাবে অদ্বৈত সমগ্র উপন্যাসে মালো সমাজ তথা বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক দুরাবস্থাকে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় 'রামধনু' এই অধ্যায়টি আরো অনেক বেশি মর্মস্পর্শী বর্ণনা। মালো সমাজ যে অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া সেটা ভালো ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজে 'পণ প্রথা' প্রচলিত থাকার কারনে কোন কোন ব্যক্তি তার কন্যা বা বোনকে বিয়ে দিতে গিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়। তা আমরা অদ্বৈতের উপন্যাসেও লক্ষ্য করতে পেরেছি —

> "বনমালীর কথা কও? তুমি ত জান দিদি, মা বাপ ভাই বেরাদর যার নাই, ক্ষেত পাখর জাগা-জমি যার নাই, টাকা-কড়ি গয়নাগাটিয়ার নাই, তারে লোকে মাইয়া দেয়? অন্তত তিনশ টাকা হাতে থাকত ত দেখতাম-মাইয়ার আবার অভাব।
>
> তিনশ টাকা! পর পর তিনটা বোনের বিবাহ হইয়াছে বাবা বাঁচিয়া থাকিতে। পণ লইয়াছে তিনশ টাকা করিয়া। আর এই টাকা দিয়া সমাজের লোক খাওয়াইয়াছে। এখন বনমালীর নিকট হইতেও তিনশ টাকা পণ লইয়া মেয়ের বাপ তার সমাজকে খাওয়াইবে। কি ভীষন সমস্যা!"[৮]

আলোচ্য অংশে আমরা এওলক্ষ্য করেছি যে কোন কোন সময় আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে অনেক পুরুষ ছেলে বিয়ে করতে পারেনা।

এছাড়া 'স্পর্শদোষ' নামক ছোট গল্পেও আমরা অদ্বৈতের অর্থনৈতিক দারিদ্র ভানার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। গল্পের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত মোটামুটি একই ছবি ধরা পড়েছে। একদিকে দেখানো হয়েছে টাকা পয়সার অভাব এবং অন্য দিকে খাবারের অভাব। খাবার চুরি করে খেতে গিয়ে বৌমা শাশুড়ীর হাতে কিভাবে ধরা পড়ছে। তাই লেখক সুকৌশলে তাঁর স্পর্শদোষ গল্পে লিখেছেন—

> "পল্লীর যে বধু শাশুড়ীর গঞ্জনা মাত্র ভক্ষন করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত উদরটাকে দিনের পর দিন শূন্য রাখিয়া নির্বিবাদে চলে-তাহাকে দেখিয়া যতটা ব্যথা না পাই, যে বৌ শাশুড়ীর রক্ষিত সুখাদ্য চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে সে আমাদের সহানুভুতি আকর্ষণ করে বেশি।"[৯]

তিনি আরও লিখেছেন-

> "অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে, অভাব তাহাদের গ-সহা। বৈদান্তিকের তাহারা নির্মল প্রশংসার অধিকারি। অভাব লইয়া যাহারা কাঁদে মানুষের বুকে দেয় তাহারা আঘাতের পর আঘাত।"[১০]

অর্থাৎ খাদ্যের অভাব সমগ্র মানবিক মানব সমাজকে ব্যথিত করছে সেই কাহিনীকে আলোচনা করেছেন।

উপন্যাস, ছোট গল্পের মত অদ্বৈতের কবিতাতেও ঔপনিবেশিক বাংলার আর্থ-সামাজিক শ্রীহীন অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। সমকালীন ক্ষুধিত ,মুমূর্ষু মানুষদের ঐ আর্থিক দূরাবস্থার জন্য তিনি প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্টি কৃত্রিম বিপর্যয়কে দায়ী করে -১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ত্রিপুরা লক্ষ্মী' কবিতার মাধ্যমে লিখেছিলেন –

"অনশনে, অর্ধাশনে জীণ শীর্ণ কংকালের মত
রয়েছে পড়িয়া
নাহিমা প্রাণের সাড়া, নাহি উৎসবের ধারা
প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া।"[১১]

এইভাবে গ্রাম বাংলার যন্ত্রনা দগ্ধ প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক অসহনীয় অবস্থা অদ্বৈত তাঁর সৃষ্টিশীল কলমের দ্বারা সাহিত্য ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া কখনো কখনো ঐ সমস্ত মরনাপন্ন মানুষদের জন্য তৎকালীন বুদ্ধিজীবি নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি বর্গের অচৈতন্য অবস্থা শ্রীঅদ্বৈতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তাই তিনি অনেক সময় সরাসরি প্রশ্ন তুলে লিখেছেন-

"সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়
কয় বড় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলো মৃত্যু মোহ তন্দ্রাতে – বিলীন।
কে বুঝিবে ব্যথা।"[১২]

এই সমস্ত কবিতার মধ্যদিয়ে লেখক অদ্বৈত যেমন তাঁর মানবিক হৃদয়য়ের প্রকাশ করেছিলেন তেমনি আর্থিক ভাবনার মাধ্যমে সমাজকেও চিত্রিত করেছিলেন।

অদ্বৈত তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে যেমন শুধুমাত্র মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় গুলিকে মনোরম ভাবে তুলে ধরে বাস্তব রূপ দান করেছেন লেখনীর দ্বারা। ঠিক তেমনি ভাবে 'ভাই ফোঁটার গান' প্রবন্ধে বাংলার সমগ্র হিন্দুদের এক মিলন মুখর উৎসব ভাই ফোঁটা উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলার মেয়েরা যে সমস্ত গান বাঁধে তাকেও সুন্দর ভাবে বর্ননা করেছেন। ঐ গান গুলির ভাষা এবং ভাব শুনলে পাঠক সমাজ ধারনা করতে পারেন যে ঐ গান গুলি বাংলার আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র, নিম্নবৃত্ত, ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গান কারণ অদ্বৈত ছিলেন ঐ সকল মানুষদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রতিনিধি যা তাঁর প্রতিটি সাহিত্য কর্মে স্থান দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ একই প্রবন্ধে মাতৃ স্নেহের কিছু প্রাচীন গানও তিনি তুলে ধরেছেন আর সেই গান গুলির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ঔপনিবেশিক বাংলার পারিবারিক দারিদ্রতা। বাঙ্গালীর পৌরাণিক কাহিনীকে অদ্বৈত বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সাথে মিলিত হতে দেখেছেন। যেমন একটি গানে শিবগৌরীর নিদারুন অভাব অনটনকে মর্মান্তিক ভাবে পরিবেশন করেছেন –

"মৃদু বাতাস এলে হাঁড়ি খুঁড়ি নড়ে,
ওমা মেনকা, আমার মন চলে না
ভাঙড়া শিবের ঘরে
শিবের ঘরে নাই দুয়ার বান্ধে
বদনে ছাউনি ছান্দে।"[১৩]

সাহিত্য হচ্ছে সমাজের দর্পণ। অদ্বৈত সেই সমাজ দর্পনে বার বার সকরুন দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য, নিম্নবর্ণীয় দলিত তথা সমগ্র মানব সমাজের আর্থিক দুরাবস্থাকে ব্যক্ত করেছেন।

শ্রী অদ্বৈত ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে কাচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যখন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন তখনও তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার মানুষজনদের প্রতি নিষ্ঠাবান হৃদয়াবেগের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। যা তাঁর লেখা চিঠি পত্রের মাধ্যমেও আমরা জানতে পেরেছি। অদ্বৈত বাবা চন্দ্র কিশোর নামে এক ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছেন যে –

"গঙ্গায় রোজি রোজগার নাই বলিয়া শুনিয়াছি।"[১৪]

রোজি রোজগার অর্থাৎ শ্রমের বা কর্মের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ। ঐ অর্থ দিয়েই মানুষ জীবন ধারন করে থাকেন। কর্ম মানুষের আর্থিক উন্নতির স্মারক কিন্তু কর্মহীন জীবন আর্থিক অবনতির প্রতীক। শারীরিক ভগ্ন অবস্থায়ও তিনি যখন মানুষজনের আর্থিক অবস্থার খবরাখবর নিচ্ছেন এর দ্বারা প্রমানিত হয় লেখক অদ্বৈত কত বড় মাপের মানবিকতা পূর্ন মানুষ ছিলেন। এবং সর্বদা তাঁর মন প্রাণ সমাজের নিচুতলার মানুষদের জন্য উদ্বেলিত ছিল।

'ভারতের চিঠি পার্ল বাক-কে' বইটি ছিল অদ্বৈতের প্রথম প্রকাশিত বই, আমরা তাঁর অন্যান্য লেখাগুলি পড়েও বুঝতে পেরেছি তিনি শয়নে, স্বপ্নে ও মননে ছিলেন নিম্নবর্ণীয়, অস্পৃশ্য, দলিত তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের সমগ্র দীনদের সেবক। তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি ঐ সমস্ত মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'ভারতের চিঠি পার্ল বাক কে' বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। পার্ল এস বাক (১৮৯২-১৯৭৩) ছিলেন মার্কিন লেখিকা তিনি ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তাঁর 'The Good Earth' গ্রন্থের জন্যে।[১৫] অদ্বৈত তাঁর ঐ গ্রন্থটি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। গ্রন্থটিতে অধ্যাপিকা বাক দেখিয়েছেন প্রকৃতির অনিয়ন্ত্রিত শাসনে চীনের মানুষজনের আর্থিক ভাগ্য কি নিদারুন ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য অনাহার ছিল তাদের ঐ সময়ের সঙ্গী। তাই দরিদ্র চাষী ওয়াংল্যাঙ জীবনে বাঁচার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। আর তাতে ঐ চীনা চাষী জয়ী হলেও কিন্তু তাদের নিত্য সমস্যা রয়ে গিয়েছিল।[১৬]

অদ্বৈত একটি পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মানব সমাজের প্রান্তিকায়িত মানুষদের যেমন প্রতিনিধি ছিলেন। ঠিক তেমনি একই ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশের মানবভূমি ক্ষেত্রেও বিচরণ করেছেন।[১৭] সমকালীন সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির বিষয়েও অদ্বৈত ছিলেন খুবই ওয়াকিবহাল। সেইজন্য তিনি 'Good Earth' পড়ে উপলব্ধী করেছিলেন যে চীনাবাসী ওয়াংলাঙ্গের প্রত্যাহিক জীবনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলার অবহেলিত মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবন সংগ্রামেরও অনেকাংশে মিল পরিলক্ষিত করেছিলেন।[১৮]

অদ্বৈতের ভারতের চিঠি গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯ - ১৯৪৫) কারণে ভারতের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ তখন বাংলায় ব্যপক ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। এছাড়া বিংশ শতব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশৃঙখলার কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও

ঘনীভূত হয়ে ওঠে ছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতের মানুষদের আর্থিক অবস্থাও ছিল সংকটপূর্ন।[১৯] সেই পরিস্তিতির কথা অদ্বৈত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভীড় ঠেলতে হয়, তারা যেন তোমার 'Good Earth' এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে কতক মরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের নারীদের কাপড় নেই; সেই দিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে যায়। অফিস ফেরত ক্লান্ত বাবুদের মুখ নিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঐ নারীরা শীর্ন শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুষ্প্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর, বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্য কনিকা, স্বর্নরেনু অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বার করে। সাহেববাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি মারামারি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয় তারপর এই করে কিছু দিনের পর জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে ফুটপাথের উপরে শুয়ে পড়ে একটি ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরও, দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহ গুলো কে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত আমাদের নেই।"[২০]

অদ্বৈত তাঁর চিঠিতে লিখেছেন পার্ল বাক একজন শেতাঙ্গ লেখিকা হয়েও তিনি তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের আর্থিক দুরাবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সহমর্মীতার পরিচয় দিয়েছেন। ঠিক তেমনি অদ্বৈত তাঁর লেখা সমুহেও ঔপনিবেশিক বাংলার মানুষদের অর্থনৈতিক দারিদ্রকে স্থান দিয়ে তিনিও বিশেষ মর্মস্পর্শী অনুভুতির প্রকাশ করেছেন।

অদ্বৈতের যে সমস্ত লেখা সমুহে বাংলার আর্থিক দারিদ্র ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য হল 'আশালতার মৃত্যু' গল্পটি। যদিও এটি তাঁর অপ্রকাশিত গল্প। আর্থিক দুর্দশার ইতিহাসের চরমতম রূপটি আমরা তাঁর এই গল্পতটির মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। অদ্বৈত গল্পটিতে তিনজন আশালতার কথা উল্লেখ করেছেন– প্রথমে যার কথা বলেছেন তিনি হলেন আশালতা চাকলাদার। যে কিনা বিংশ শতব্দীর চারের দশকে দুর্ভিক্ষ জনিত কারনে অন্নের অভাবে মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত আশালতা তালুকদার, আমরা জানি অন্ন, বস্ত্র, বাস্থান তিনটি হল মানুষের প্রধান চাহিদার বিষয়বস্তু ঐগুলি ছাড়া মানুষের জীবন সংশয় হয়ে ওঠে সেই রকম আশালতা তালুকদার মৃত্যুবরণ করেছিল তার শারীরিক লজ্জা ঢাকবার বস্ত্রের অভাবের জন্য। এবং শেষজন হলেন পূর্ব্বঙ্গের আশালতা মণ্ডল সে মৃত্যুকে শ্রেষ্ঠ পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অভাবের জন্য। ১৯৪০ এর দশকে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার ফলে সাধারন মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠেছিল আর সেই কথা বর্ননা করতে গিয়ে অদ্বৈত প্রশ্ন করেছেন –

> "অমুকগাঁয়ের আশালতা চাকলাদার নামে এক কুলবধূ না খেয়ে আজ মারা গিয়েছে মহামান্য সরকার এ সম্বন্ধে কী বলেন।"[২১]

এই প্রশ্নের উত্তরে সরকারের তরফের মনোভাবের কথাও অদ্বৈত ব্যকুলভাবে বর্ননা করেছেন –

> "সরকার হচ্ছে এমনি এক বস্তু যার মধ্যে কোন দিন কোন দোষ স্পর্শে না। মন্দ লোকেরা যাই বলুক, তিনি তো জানেন তিনি সিজারের স্ত্রীর মতো সৎ, আর যীশুর মত নিস্পাপ। তাঁর দায়িত্বের অধীনে কোণ লোক না খেয়ে মারা যাবে এটা যে কিছুতেই হতে পারেনা। এটা নিশ্চিত মন্দ উদ্দেশ্য প্রনোদিত সংবাদ। ...যা হোক, সরকারি তদন্ত হল এবং সেই তদন্তের ফল সরকারি বিবৃতি হিসাবে কাগজে ছাপা হল তাতে বলা হয়েছে আশালতা মারা গিয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু না খেয়ে মারা গিয়েছে একথা মিথ্যা। আসলে তার মাথা খারাপ ছিল এবং অত্যধিক খাওয়ার ফলে দম আটকে গিয়ে সে মারা যায়।"[২২]

সরকারি এই বিবৃতি গুলি যে মিথ্যা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সরকারি উদাসিনতার জন্য সমাজের এই আর্থিক পরিস্থিতি বলেই মনে করেন লেখক। অর্ধশতাব্দী অধিক কাল আগে শ্রীঅদ্বৈত সরকারি মনোভাবের যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গল্প, কবিতার মাধ্যমে তা আমরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক ভাবনা সম্পর্কে সরকারি মনোভাবেরও একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ করে থাকি।

উপসংহার : অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাহিত্যিক সৃষ্টি ফসলগুলি আধুনিক যুগের হলেও তাঁর বহু রচনা অনেক দিন নির্জন নিভৃতে অবস্থান করেছিল। বর্তমানে সেগুলি আবিষ্কারের ফলে সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণা ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি পাচ্ছে। তিনি সমাজ, রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়ক লেখা সমূহেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন যা আমরা উপরিউক্ত উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ গুলি বিশ্লেষন করে অনুভব করতে পারি। ১৯৪০ এর দশকে ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতে এবং ভারতের বাইরের যে অর্থনৈতিক দারিদ্র বা অভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেই ইতিহাসকেও তিনি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সমাজের নিম্নবর্নীয় সম্প্রদায়ে অবস্থান করলেও তাঁকে আমরা সমাজের সমস্থ মুক্তিকামী অসহায় মানুষদের প্রতিনিধি রূপেও পেয়েছি।

তথ্যসূত্র :

১. মাইতি, ড. প্রদ্যোত কুমার : ইতিহাস পরিক্রমা, মাইতি পাবলিকেশন, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১১, পৃ. ১৯
২. বর্মণ, রূপ কুমার : 'হ্যাঁ নিম্নবর্গীয়রা লিখতে পারে', বাংলা জর্নাল, কানাডা, খণ্ড-২১, ১৪২২, পৃ. ৫৭
৩. বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পাদিত) : 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. viii
৪. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : 'তিতাস একটি নদীর নাম', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০
৫. তদেব : পৃ. ১২৬
৬. তদেব : পৃ. ১৪২ - ১৪৩
৭. তদেব : পৃ. ১৪৮
৮. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৯. বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পাদিত) : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১০. তদেব : পৃ. ২০
১১. বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পাদিত) : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১২. তদেব : পৃ. ৩৪
১৩. তদেব : পৃ. ১০০
১৪. তদেব : পৃ. ১৩৪
১৫. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি : 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ, অতীতের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা খুঁজে, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৪ ডিসেম্বর, পৃ. ৩৯
১৬. তদেব : পৃ. ৩৯
১৭. বর্মণ, রূপ কুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
১৮. বিশ্বাস, মনোহর মৌলি : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৯. ভট্টাচার্য্য, তপোধীর : 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫০
২০. বিশ্বাস, অচিন্ত (সম্পাদিত) : তদেব, পৃ. ৫৬৫
২১. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত : 'আশালতার মৃত্যু', পুনর্মূদ্রন ভাসমান-১০, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১-৮
২২. তদেব, পৃ. ৪